স্বাধীনতা, মানবতা ও বাংলাদেশ

- আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন

প্রবাসে পত্রিকা পড়া বা ইন্টানেট ব্রাউজ করা যাদের হবি, তাদের প্রিয় বিষয় বোধ করি বাংলাদেশ । বাংলাদেশের খবরে যেমনি আছে নতুনত্ব, তেমনি আছে চমক । প্রতিদিন লোমহর্ষক ঘটনা আর ছবিতে ভরা। যেমন ধরুন গত আগষ্ট ০৮, ২০০২ সাল, প্রায় সব পত্রিকায় একটা ছবি সহ খবর ছাপা হয়েছে, যাতে দেখা যাচেছ একজন প্রায় উলঙ্গ মানুষ রাস্তায় পড়ে আছে, রক্তাক্ত শরীর, হাত দুটি দিয়ে একটি লাঠির আঘাত থেকে শরীরকে বাঁচানো চেষ্টা করছে । আশে পাশে অনেক লোক দাড়িয়ে আছে, তাদের কয়েক জনের হাতে উত্তোলিত লাঠি । ছবির ক্যাপশন, ছিনতাইকারী সন্দেহে জনতার হাতে একজন নিহত। এখানে দুটি শব্দ লক্ষনীয়, সন্দেহে এবং একজন । এ দুটি শব্দের মধ্যে যেন কোথায় একটা বিশাল শুণ্যতা, সে শুণ্যতার অন্ধকার ঢেকে ফেলছে মানব সভ্যতার সহস্র বর্ষের ইতিহাসের অহংকারকে । শুধু মাত্র সন্দেহের কারনে যে লোকটাকে মেরে ফেলা হলো, সে একজন মানুষ হিসাবে তার একটা নাম ছিল, যা আমরা কখনই জানতে পারবো না, কারন সে আত্নপক্ষ সমর্থনের মত নূন্যতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে ।

এটা শুধু মাত্র একটা বিচ্ছিন্ন ঘঠনা নয় । চলতি ২০০২ সালের জুলাই পর্যন্ত শুধু মাত্র সন্দেহের কারনে সর্বমোট ১৬৭ জনকে এ ধরনের করুন পরিনতি বরন করতে হয়েছে । এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে এ বৎসরের প্রথম দিকে মতিঝিলে, ৪ জন জলজ্যান্ত লোককে পুড়িয়ে মারার মত অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে হাজার হাজার মানুষ । লক্ষ্যনীয় যে, সে সময় একটি মোটর সাইকেল পুড়তে দেখা যায়, দাবী করা হয় যে, বাহনটি ব্যবহার করছিল ঐ মৃত মানুষ গুলি । প্রশ্ন আসে একটা মোটর সাইকেলে সর্বোচ্চ ৩ জন বহন করা যায়, তবে বাকী একজন এলো কোথা থেকে (?), এ প্রশ্নের উত্তর আমরা কখনো পাবো না । কখনোই জানবো না যে, ঐ মৃত মানুষ গুলি প্রকৃত পক্ষে অপরাধী ছিল কি না ? দীর্ঘ তিন যুগ আগে লক্ষ প্রানের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মূল বিষয় মানুষের অধিকার বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডে কি প্রতিষ্ঠা পায়নি? তবে কি মানুষে সাংবিধনিক অধিকার শুধু মাত্র ছাপার অক্ষর হয়েই থাকবে? কেন? এ উত্তর পেতে হলে আমাদের কিছু পিছনে ফিরে যেতে হবে, জনতে হবে প্রকৃত ঘটনাবলী ।

বস্তুত পক্ষে ২০০১ সালের জুলাই মাস থেকে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তারই প্রেক্ষিতে মানবতা আর মানবাধিকারের বিষয়টি প্রবল ভাবে আলোচিত হচেছ । এ বিষয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ শীর্ষক কনভেনশন । কানাডার মন্টিয়লে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একই ধরনের আর একটি কনভেনশন । এ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, পক্ষে বিপক্ষে । কেউ বলছে দেশের ভাবমূর্তি নষ্টের চক্রান্ত, কেউ বলছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত । এ ধরনের প্রশ্নের জবাব খুবই পরিস্কার । প্রশ্ন করা যেতে পারে ২০০১ এর আগে কি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্হিতি খুব ভাল ছিল, না । তবে হঠাৎ করে এ আলোচনা জোরালো হলো কেন? যারা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের খবরাখবর রাখেন, তাদের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর জানা আছে । কখনো কি কেউ চিন্তা করেছে ৪ বৎসরের শিশু নওশীন বাবার কোলে থেকেও ঘাতকের বুলেট থেকে রেহাই পাবে না, কেউ কি কখনো কল্পনা করেছে একটি স্বাধীন দেশে গভীররাতে ছাত্রী হলে পুলিশ বর্বর হামলা চালাবে, থানায় নিয়ে যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের, মহিমাকে গনধর্ষিত হয়ে সম্মান বাঁচানোর জন্যে আত্নহনন করতে হবে, আইন প্রয়োগকারীদের দ্বারা অপমানিত হয়ে আত্নহত্যা করবে সিমি, ছবি রানীকে যুদ্ধ করতে হবে বাঁচার জন্যে, শুধু একটি

মতের বা ধর্মের অনুসারী হওয়ায় জীবন ও জীবিকা হবে হুমকীর সম্মুখীন । এমনও খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, ধর্ষনকালে ধর্ষিতার পিতা ধর্ষকদের অনুরোধ করছে, বাবারা , তোমরা একজন একজন করে যাও, আমার মেয়েটা ছোট, সহ্য করতে পারবে না, মরে যাবে । শুধু মাত্র ১৯৭১ সালেই পাকিস্তানীদের দ্বারা সংগঠিত এ অবস্থা দেখেছে বাংলাদেশের মানুষ। ২০০২ সালে কি বাৎলাদেশে কোন যুদ্ধ চলছে, এ যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে কার ? এটা কি সভ্যতার বিপক্ষে, মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয় ? এখনও কি বিবেকবান মানুষের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব, সুস্থ মানুষের পক্ষে এরমধ্যে কোন রাজনীতি আবিস্কার করা সম্ভব ?

এবার আসা যাক স্বাধীনতা আর মানবাধিকারের কিছু মৌলিক বিষয়ে । ২য় বিশ্ব যুদ্ধের আগে পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল ছিল উপনিবেশিকতার নাগপাশে আবদ্ধ । সে ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অর্থ ছিলো ভৌগোলিক স্বাধীনতা, যা কালক্রমে অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে । এখন স্বাধীনতা অর্থ মানুষের স্বাধীনতা, যা ভিন্ন রাষ্ট্রীয় সীমানায় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষিত হয় । উদাহরণ হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে ১৯৬৬ সালে গৃহিত জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাকে সার্বজনীন মানবাধিকার দলিল হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে । প্রকৃতপক্ষে ২য় বিশ্বযুদ্ধ এ ঘোষণা প্রণয়নে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করেছে । ২য় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালে মানবতা এবং মানবাধিকারের বিষয়টি তেমন ভাবে আলোচিত হয়নি । অবশ্য অগ্রবর্তী চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় । যেমন, রুশো বলেন , মানুষ জন্ম নেয় স্বাধীনতা নিয়ে, তারপর ধীরে ধীরে পরাধীন হতে থাকে । এ অবস্থায় মহাযুদ্ধ আর তার ধংশলীলা রাজনীতিকদের মনোভাবের ব্যাপক পরিবর্তন আনে, ফলশ্রুতিতে রুজভেল্ট স্বাধীনতার সংজ্ঞায় চারটি মাত্রা যোগ করেন : বাক বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বীয় পথে ঈশ্বরের উপাসনার স্বাধীনতা, অভাব ও ভয় থেকে মুক্তির স্বাধীনতা । তারপরেও ১৯৪৭ সালের জাতিসংজ্ঞের মানবাধিকার কমিশনের বৈঠকের সাফল্য ছিল সন্দেহের দোলায় দোলায়িত । ১৯৬৬ সালে গৃহীত জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার পর পৃথিবীতে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আসে, উন্মুক্ত হয় মানবাধিকার কর্মকান্ড, আঞ্চলিক স্বাধীনতার পথ হয় প্রসস্থ । কিন্তু সর্বত্র এ পরিবর্তনের ঢেউ সমানভাবে লাগেনি, কেউ কেউ হয়েছে অগ্রবর্তী - যেমন কানাডা, কেউ আজও বন্ধ রেখেছে তাদের দ্বার । ষাট দশকে এবং পরবর্তীতে ভৌগলিক স্বাধীনতা পাওয়া রাষ্ট্রের অধিকাংশ উক্ত ঘোষণার আলোকে সংবিধান প্রণয়ন করে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম ।

১৯৭১ সালে পাকিস্থানী বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞ স্বাধীন বাংলাদেশকে জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার সাথে একাত্ম করে দেয়, যার প্রতিফলন দেখা যায় সংবিধানের আদি সংস্করনে, যা বহাল ছিল ১৯৭৪ পর্যন্ত। পরের ইতিহাস ভয়াবহ । একের পর এক সংশোধনী সংবিধানকে কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা করে ফেলেছে । সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হয়েছে দফায় দফায় জারিকৃত সামরিক ফরমানের বৈধতার লেবাস পরাতে গিয়ে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৭৭ সালের ২৩শে এপ্রিল এক সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মূলনীতি ধর্মরিপেক্ষতা বিসর্জন দেয়া হয়, যা ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর প্রথম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। যার ধারাবাহিকতায় আরেক সামরিক শাসক সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের বিধান সংবিধানে সংযোজনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুর ধর্মীয় স্বাধীনতার পথকে সরু ও কঠিন করে তুলেছে । এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে না, তাদের জন্যে সংবিধনের বাকী অংশ প্রযোজ্য নয়, সুতরাং রাষ্ট্রের কাছে তার সংবিধানিক কোন দাবী থাকে না । সে অর্থে তারাতো সবাই রাষ্ট্রদ্রোহী । সে ক্ষেত্রে শাসকদলের কর্মীবাহিনী ও আইন শৃংক্ষলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধর্মীয় সংখ্যালঘু পীড়নকে তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব মনে করা অসংগত না।

বাংলাদেশের একজন নাগরিক যে যে সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করবে - মত ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার এবং ন্যায় বিচারের অধিকার । এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে । জুলাই ২০০১ থেকে পরবর্তী কয়েক মাস পত্রিকার পাতায় যে সমস্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় শুধুমাত্র একটা দলের আদর্শে বিশ্বাসী বা একটি ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারনে অসংখ্য ঘটনায় প্রাণ দিতে হয়েছে অনেককে, ধর্ষিতা হয়েছেন পূর্ণিমা শীলের মত অনেক, আবাসভূমি ত্যাগ করেছেন অনেক পরিবার । তারপর নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায়

যায় ৪ দলীয় জোট সরকার । নাগরিক অধিকার রক্ষার শপথ গ্রহনকারীরা যেন শুরু করলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ২য় পর্যায় । ধর্ষিতা পূর্ণিমা শীলের পক্ষে কথা বলার অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির । স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে শহীদ জহির রায়হান আর শহীদুল্লাহ কায়সারের ভাই মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবিরকে মুখোমুখি হতে হলো রাষ্ট্রদ্রোহীতার । পিতা আর ভ্রাতার মতাদর্শের ভিন্নতার কারনে ধর্ষিত হয়ে আত্নহনন করতে হয়েছে মহিমাকে । এতো গেল কিছু খন্ডচিত্র । একটা পরিসংখ্যান থেকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা ভালভাবে উপলদ্বি করা সম্ভব । মিডিয়া ওয়াচের রিপোর্টে প্রকাশ জুন মাসে (২০০২) ধর্ষন ও ঐ ধরনের ঘটনা ঘটেছে ১৮১৩ টি । এখন পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেই গা শিউরে উঠে ।

এ কথা বলা সঙ্গত হবে না যে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হঠাৎ শুরু হয়েছে । ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ সময়কালে পাকিস্থানী সামরিক বাহিনী, তাদের দোসর রাজাকার আল-বদর আল-শামশ বাহিনীর মানবতাবিরোধী অপরাধ শুধুমাত্র নাজী বাহিনীর বর্বরতার সমতুল্য। স্বাধীনতার পর দেশ ´গঠনের শুরুতেই বিভিন্ন মতবাদের অনুসারীরা শুরু করে বিপ্লবের নামে গুপ্তহত্যা । প্রনীত হয় বিশেষ ক্ষমতা আইন, যা উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত ৫৪ ধারার উপর বোনাস। ৫৪ ধারা রয়ে গেল প্রশাসনের স্থানীয় পর্যায়ের জন্যে অবৈধ আয়, পীড়ন আর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অস্ত্র হিসাবে । ১৯৭৫ সালের সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য হত্যাকান্ড, জেলহত্যা, ও হত্যাকারীদের রক্ষার লক্ষ্যে ইনডেমনিটি আইন ইত্যাদি বাংলাদেশের মানবাধিকার ইতিহাসের এক কলংঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে । তারপর পরপর দুইবার সামরিক শাসনে বিপর্যস্ত হয়েছে দেশ । ১৯৯০ সালের সামরিক শাসনের বিদায় একটি গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সম্ভাবনা তৈরী হলেও দীর্ঘকাল গনতান্ত্রিক পরিবেশের অভাবে ও সামরিক শাসক আর তাদের সহযোগীদের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ, অসৎ ও কালো টাকার মালিকদের উপর নির্ভরশীলতার কারনে দেউলিয়া রাজনৈতিক দলসমূহ এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় । রাজনৈতিক শক্তির ব্যর্থতার সুযোগে বিভিন্ন সময়ের পরাজিত শক্তিগুলি আবার ক্ষমতার শীর্ষে ফিরে এসেছে । ১৯৭১ সালের বুদ্ধিজীবি হত্যার দায়ে অভিযুক্ত নিজামীচক্র, ১৯৯০ সালের গনতন্ত্র হত্যাকারী মওদুদ গং, ১৯৭৫ সালের জেল হত্যার অভিযুক্তরা এখন বাংলাদেশের নীতিনির্ধারক। এ দিকে উপনিবেশিক সিভিল প্রশাসনে উত্তরাধীকার বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন জবাবদিহিতার অভাবে মানবাধিকার বিরোধী আইন যেমন - ৫৪ ধারা, বিশেষ ক্ষমতা, সন্ত্রাস দমন, জননিরাপত্তা, দ্রুত বিচার ইত্যাদির ব্যবহার করে দেশকে অনেকগুলো কলোনীতে ভাগ করে শাসন করছে, যেখানে রাজনৈতিক দলসহ সকলে তাদের প্রজা । ১৮ আগষ্ট ২০০২ যুগান্তরে প্রকাশিত এ খবরটি মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থার একটা উদাহরন মাত্র । খবরে প্রকাশ জেলা প্রশাসকের অফিস কক্ষের দরজায় টোকা দেওয়ার দায়ে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে হাজতে পাঠানো হয় মিনহাজ কুরিয়ার সার্ভিসের এক কর্মীকে, যে কুড়ি দিন যাবৎ সে হাজত বাস করছে । এমন পরিস্থিতে মানবাধিকার আর মানুষের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার শপথ গ্রহনকারী সরকারের অবস্থান কোথায় ? যেনতেন ভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার যে জোট গঠিত হয়, গনবিরোধী-স্বাধীনতাবিরোধী-মানবতাবিরোধীরা সেখানে সহজেই স্থান পেয়েছে । যার ফলে সরকার প্রথম থেকেই তার দায়িত্ব-কর্তব্য বাদ দিয়ে বিরোধী নিধণ যজ্ঞে মত্ত হয়ে উঠেছে । এ আক্রমন এতো নীচু ও নোংরা যা আগে কখনো কল্পনা করা যেত না । এখানে একটা সাম্প্রতিক ঘটনা বলা যেতে পারে । গত ১৭ই আগষ্ট সাবেক বিসিসিবির সভাপতি ও প্রতিমন্ত্রির নামে ফেরী থেকে ২০০০ টাকার প্লেট চুরির মামলা করা হয়েছে । সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের মানবতাবিরোধী এধরনের নীতির ফলে সমগ্র দেশে শুরু হয় সংখ্যালঘুদের উপর পীড়ন । হত্যা, ধর্ষন আর লুটপাট হয়ে যায় স্বাভাবিক বিষয়ে । শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গোপাল মুহুরী , বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজৌতি, পথকবি মোসলেমউদ্দিন এ তান্ডবের শিকার হয় । এ প্রসংঙ্গে বর্তমান সরকারের আইনমন্ত্রী, যিনি মানবতাবিরোধী সামরিক শাসনের সুবিধাভোগীদের অন্যতম, সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে বিবিসিকে বলেন, তারা শুধুমাত্র হিন্দু হিসাবে নয়, আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসাবে জনরোষের শিকার হচ্ছে । আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেলিকাপ্টারে নির্যাতিত এলাকার উপর দিয়ে উড়ে এসে কোন সন্ত্রাসী দেখতে না পেয়ে সমস্ত খবরকে মিথ্যা প্রমান করলেন । কিন্তু খোদ রাজধানীতে বাবার কোলে শিশু নওরীন গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরন করলে, ঈশ্বরের উপর সব ছেড়ে দিলেন । এতো গেল উচ্চ মহলের কথা, নীচে কি হচ্ছে ? এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গেলে এক মহাকাব্য বলা হয়ে যাবে । শুধু এটুকু বলা যায়, দেশের প্রতিটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে সরকারী ক্যাডার বাহিনী । ক্যাডার বলতে শুধুমাত্র যুবকদের বুঝাচ্ছে না, সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সব ক্যাডারের দখলে, ক্যাডারের স্বার্থ রক্ষার জন্য ক্যাডার ভিসি রাতের আঁধারে

ছাত্রীদের উপর বর্বর হামলা চালানোর জন্যে পুলিশ ডেকে আনতে এবং ১৯৭১ এর পর প্রথম এধরনের ঘটনা ঘটাতে একটুও কুন্ঠা বোধ করেননি । ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে । যথাযথ আনুগত্য প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় স্বদলীয় রাষ্ট্রপতিকে বিদায় দিয়ে খোঁজা হচ্ছে ১০০% ক্যাডার । সাধারন মানুষের অধিকারের কথা চিন্তা করার সময় তাদের নেই । আর অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকরা কি করছে ? বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মুজাফফর আহমেদ বিবিসিকে বললেন, বাংলাদেশের মানুষের এখন একমাত্র দাবী, স্বাভাবিক মৃত্যুর অধিকার নিশ্চিত করা ।

কেন এ অবস্থা হলো ? এর উত্তরের জন্যে আমাদের যেতে হবে ইতিহাসবিদদের কাছে, যেতে হবে সমাজবিদদের কাছে, যেতে হবে অর্থনীতিবিদদের কাছে । তারপরও সাধারণভাবে যে সমস্ত কারন চিহ্নিত করা যায়, তা নিম্নরূপ ঃ

১) গনতান্ত্রিক চর্চার অভাব ঃ ঐ অঞ্চলে প্রাক ঐতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে মুক্ত ও স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্যে মানবাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়নি । ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কারনে ব্যর্থ হয়ে যায় ।

২) সমাজ বিকাশে বাঁধা ঃ লক্ষ্যনীয় যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরনে সময়কালে ঐ অঞ্চল ছিল উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যস্ত, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার নামে হয় প্রতারিত, ১৯৭৫ সাল থেকে বারবার নিজস্ব সেনাবাহিনীর দ্বারা পরাজিত ও শৃংখলিত হয়ে সমাজের বিকাশ হয়েছে অদ্ভুদভঙ্গীতে । ফলে যে সামাজিক অবস্থা এখন বাংলাদেশে বিরাজমান তা অসুস্থ পুঁজিবাদ আর পঁচে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মিশ্রন, যেখানে না থাকবে মানুষের কোন অধিকার, না থাকবে মানবতা। সম্পদ ও ক্ষমতা হবে নিয়ামক শক্তি ।

৩) অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ সমান্তরাল ও লক্ষ্যবিহীন একাধিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ভিন্নমতাবলম্বী ও অসহিষ্ণু জনশক্তি তৈরী হচ্ছে দীর্ঘকাল যাবৎ, যা মানবিক বোধ সম্পন্ন একটি সমাজ গঠনে প্রধান অন্তরায় ।

তবে কি বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী এ অমানবিক নারকীয় অবস্থা থেকে কখনো মুক্তি পাবে না, নিঃশ্বাস নিতে পারবে না একটা মুক্ত - স্বাধীন সমাজে । অবশ্যই পারবে । সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাজগুলো এখনই শুরু করতে হবে । সে বিষয়ে বলার আগে বর্তমান সরকারের এক গুরুত্বপূর্ন মন্ত্রীর মুখ ফসকে বলা একটা বক্তব্যর পুনরাবৃত্তি করা প্রাসঙ্গিক মনে করি । তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র নিজেই সন্ত্রাসী - ৫৪ ধারায় ধরে পুলিশ সবাইকে পিটায় । কিন্তু পরদিন তিনি পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে এ উক্তি অস্বীকার করেছেন । এ ঘটনাই আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির পথ বলে দিচ্ছে । এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ক্ষমতাশীন ও ক্ষমতাপ্রার্থীরা সকলেই বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা রাখেন । যদিও কোন না কোন সময়ে তারা সকলেই নিগৃহীত হয়েছেন, কিন্তু টাকা - ভোট - টাকা চক্রের থেকে মুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব বর্তমান অবস্থায় নয় । এ চক্রের একটা অংশের উপর আমাদের, অর্থাৎ সাধারনের খানিকটা নিয়ন্ত্রন আছে - সেটা হচ্ছে জনমত, আর আমাদের এগুতে হবে সে দিক দিয়েই । এ জন্যে দরকার একটা প্রচন্ড সামাজিক আন্দোলন। সে আন্দোলনের লক্ষ্য হবে সাধারন নাগরিকদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং রাজনীতিকদের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা যাতে তারা নিজ উদ্দ্যোগে নিচের পদক্ষেপ গুলি বাস্তবায়ন

করেন।

জরুরী করনীয় সমূহঃ

১) সংখ্যালঘু ও ভিন্নমতাবলম্বীসহ সকল গোষ্ঠীর নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া, দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে ।
২) সমাজের অস্থিরতা ও ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ্যে পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীকে আধুনিক ও যুগোযোগী করে আমূল সংস্কার করতে হবে।
৩) সংবিধানের বিধান মতে ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে ।
৪) বাংলাদেশের সংবিধানকে ১৯৭২ এর আদি অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হবে ।
৫) ১৯৯৩ সালের ২০শে ডিসেম্বরের জাতিসংঘের প্যারিস প্লানারী অধিবেশনের ৪৮/১৩৪ রেজিল্যুশন অনুযায়ী মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে হবে ।
৬) মানবাধিকার বিরোধী ৫৪ ধারা, বিশেষ ক্ষমতা আইন, দ্রুত বিচার আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল করতে হবে।
৭) শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে সম্পূর্ন স্বাধীনতা দিতে হবে ।
৮) সংবিধানের আওতার বাইরে যে কোন বিচার ব্যবস্থা বা তার উদ্দ্যেগকে সম্পূর্ন নিষিদ্ধ করতে হবে ।
৯) বর্তমার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি মানবিক, কর্মমূখী ও একধারার শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে ।

সময় যত গড়িয়ে যাবে, পরিস্থিতি ততই খারাপ ও জটিল হবে । তাই দেশে বিদেশে যেখানে আছি, সবাই বাংলাদেশে একটি মানবিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হই । ক্ষমতালোভী রাজনীতিকদের সৃষ্ট কৃত্রিম মতভেদ ভুলে অমানবিক জীবনযাপনকারী সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলি, এভাবে চলতে পারে না । লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতাকে এভাবে অর্থহীন হতে দিতে পারি না ।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের মানবতা
শীর্ষক আলোচনা সভা

আগষ্ট ৩১, ২০০২
টরোন্টো, কানাডা

মূল প্রবন্ধ